The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

আল মাহমুদের কবিতায় লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের চালচিত্র
[Portrayal of Folk Beleif and Rituals in the Poems of Al Mahmud]

Dr. Mahamuda Akter
Associate Professor, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 23 February 2025
Received in revised: 30 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Al Mahmud, Poetry, Folk belief and Rituals

ABSTRACT

In modern Bengali poetry, Al Mahmud (1936-2021) was recognized as a renowned poet of the 50s. A significant basis for distinguishing poet Al Mahmud from other contemporary poets in poetic judgment is that his poetry is rich in various elements of folklore, folk life, and culture. By artistic presentation of various folk elements Al Mahmud tried to be focused and remained committed on establishing communism, optimism, and positive life in his poetry, instead of hostile life. Folk beliefs and rituals are essential to folk life and culture as they are highly, respectfully used, and practiced elements in worshiping a better rural or citizen life. Although Al Mahmud is a modern, civilized poet, he has enormously cast the folk elements like folk beliefs and rituals in his poems intentionally or unintentionally. The eternal affection for the folk elements of Al Mahmud highly encouraged me to investigate the existence, nature, distribution, and significance of folk beliefs and rituals in his poetry.

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এই সংঘবদ্ধ জীবনের উৎসব-আনন্দ-বেদনার ক্ষণমুহূর্তে জন্ম হয় কবিতার। প্রাচীন সমাজে মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে যে সংঘবদ্ধ কর্মযজ্ঞ (যেমন পশুশিকার, কৃষিকাজ) পরিচালিত হতো; সেই কায়িক শ্রমের ক্লান্তি ও একঘেয়েমি দূর করে কর্মপ্রেরণা যোগাতো সংগীতময় কাব্য। এজন্যই কাব্যের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংগীতময়তা। প্রয়োজনের তাগিদে আবির্ভূত হলেও কাব্যের মধ্যেই লোকসংস্কৃতির সুপ্ত অভিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়। কৃষিনির্ভর মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে, বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানে লোকসংস্কৃতির উপস্থিতি বহুকাল থেকেই লক্ষণীয়। এ ছাড়াও নদী, সাগর, খাল-বিলের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-কর্মে লোকসংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিদ্যমান। কাজেই 'লোকসংস্কৃতি যেমন মানুষের আদি এবং মৌলিক সম্পদ, কবিতাও তেমনি মানুষের সাহিত্যধারার আদি অর্জনরূপে পরিগণিত হয়। এই সৃষ্টি উৎসবিচারে কবিতা ও লোকসংস্কৃতি পরস্পর বিশেষভাবে ওতপ্রোত।'[১] ফলে প্রাচীন যুগ থেকে কবিগণ চেতন-অবচেতনে জাতির আদি ঐতিহ্য, বিশ্বাস, মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখতে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গের সমন্বয়ে কাব্য রচনা করেছেন।

ঐতিহ্যের শিকড়ে প্রত্যাবতন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় আত্মসচেতনতাবোধ জাগ্রত করে কবিতা রচনায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন পঞ্চাশ দশকের কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ। তাঁরা আধুনিক প্রকরণে, স্বতন্ত্রকাব্য ভাষা ও নতুন জাতীয়তাবাদী ভাবধারা যুক্ত করে বাংলাদেশের কবিতার নবযাত্রা সূচনা করেন। তিরিশের কবিদের প্রেম, প্রকৃতি, মানবতাবাদ, প্রগতিধর্মিতা, জগৎ ও জীবন এবং জসীমউদ্‌দীনের লোকায়ত জীবনভাবনাকে আত্তীকরণে পঞ্চাশের কবিরা বাংলা কবিতার আবহমান দেশজ ঐতিহ্যকে কবিতায় সম্প্রসারণ করে সফলতা অর্জন করেন। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন আবদুল গণি হাজারী (১৯২১-১৯৭৬), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬) প্রমুখ। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রকরণে লোকায়ত জীবনবোধ ও ঐতিহ্য অন্তর্বয়নে ভিন্নমাত্রার কবিতা সৃষ্টিকারী শক্তিমান কবি আল মাহমুদ। তিরিশের দশকের কাব্যপ্রবণতার ধারায় অনুপ্রাণিত ও এলিয়টিয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত কবি আল মাহমুদ প্রথম থেকেই লোকঐতিহ্য অনুরাগী কাব্য রচনায় ব্রতী হন। লোকায়ত বাংলার বিস্তীর্ণ মাঠ-ঘাট-চর, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি, নদীকেন্দ্রিক জনজীবনের সংগ্রাম, কৃষাণ-কৃষাণীর প্রেম-বিরহ-দুঃখ-আনন্দ, উৎসব, ক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়কে উপজীব্য করে লিখেছেন একের পর এক শিল্পসফল কাব্যগ্রন্থ। পরম মমতায় কবিতায় তুলে এনেছেন লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ যেমন: লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকশিল্প, লোকযান, লোকক্রীড়া, লোকবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, লোকাচার, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকনাম-খেতাব-উপাধি, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার ইত্যাদি। তবে কবিতায় লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কার রূপায়ণে অনন্য স্বাক্ষর রেখেছেন কবি আল মাহমুদ। জীবিকা ও প্রতিষ্ঠার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে নগরে স্থায়ী হলেও কবিতায় কবির গ্রামীণ

জীবনাভিজ্ঞতার নান্দনিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাঁর কবিতায় লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিরূপণার্থে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের তাত্ত্বিক দিকটি কিছুটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

লোকায়ত জীবন ও সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। ইংরেজি 'Folk belief' ও 'Superstition'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোক-বিশ্বাস' ও 'লোক-সংস্কার' গৃহীত হয়েছে। তবে ইংরেজি 'Superstition'-এর আভিধানিক বাংলা অর্থ 'কুসংস্কার'। ফলে 'Superstition' শব্দে লোকসংস্কারের সমগ্রতা ধরা পড়ে না। কেননা লোকসংস্কারের মন্দ দিক যেমন রয়েছে তেমনি ভালো দিকও আছে। তাই প্রবন্ধের ইংরেজি শিরোনামে আমরা 'Superstition' শব্দটির স্থলে 'Ritual' ব্যবহার করেছি। 'Ritual' এর বাংলা অর্থ 'আচার' বা 'ক্রিয়াকলাপ'। লোকসংস্কারেও সংহত সমাজের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ক্রিয়াকর্ম, আচার-আচরণ যুক্ত থাকে।

লোকায়ত সমাজে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিশীলন ও লালন-পালন হয়ে থাকে। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ব্যক্তিমানসে কাছাকাছি দুটি উপলব্ধি। এ সম্পর্কে গবেষকের মন্তব্য,

> লোকবিশ্বাস মূলতঃ লোক-সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি স্তর মাত্র। কারণ লোক-বিশ্বাসে কোনও বিশেষ বস্তু, ঘটনা বা মানসিকতার স্বীকৃতি দেয়া হয়। অন্যদিকে লোকবিশ্বাস যদি লোক সমাজের জীবনাচরণে কার্যকরীভাবে প্রকাশ পায়, যদি তা ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানে রূপায়িত হয়, তাহলে তা পরিণত হবে লোক-সংস্কারে। একটি বিশ্বাস একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মনে যতক্ষণ অবস্থান করে, ততক্ষণ তা লোক-বিশ্বাসই বটে। কিন্তু যে মুহূর্তে তা সামাজিক স্বীকৃতি পায়, সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপে যখন যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে তখন তা পরিণত হয় লোক সংস্কারে।[২]

অর্থাৎ লোকসংস্কার একটি জাতির দীর্ঘদিনের লালিত-চর্চিত বিশ্বাসের সমষ্টি যা ঐতিহ্য বা পরম্পরায় সেই জাতিকে প্রভাবিত করে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে 'লোকবিশ্বাস হচ্ছে সেইসব বিশ্বাস যা কোনো বস্তু ও ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় অপেক্ষা অলৌকিক ও প্রথাগত বিশ্বাসকেই গুরুত্ব'[৩] দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লোকসমাজে বিপদ-আপদ কিংবা রোগমুক্তি কামনায় অদৃষ্টশক্তি, যেমন পির বা লৌকিক দেবদেবীর উপর নির্ভর করা হয়। চৈত্র মাসে বিয়ে না করা, বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় না ডাকাও লোকবিশ্বাসেরই প্রভাবজাত। যদিও সুশীল সমাজের কাছে তা অন্ধবিশ্বাস কিন্তু লোকসমাজে তাই বদ্ধবিশ্বাসে রূপান্তরিত। কোনো যুক্তি কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক মতামতের গুরুত্ব সেখানে অর্থহীন। আর 'যে সংস্কারগুলো সমাজে দীর্ঘদিন প্রচলিত থাকার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যকর রূপ লাভ করে তাকেই লোকসংস্কারের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়।'[৪] লোকবিশ্বাস যুক্তি-বুদ্ধির উর্ধ্বে লোকমানসের অন্তস্তল থেকে ঐতিহ্যানুসারে প্রবাহিত হয়ে থাকে; আর লোকসংস্কার লোকচৈতন্যের সমষ্টিক বিশ্বাসের রূপ। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সূক্ষ্ম পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন লোকগবেষক বরুণকুমার চক্রবর্তী। তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ আচার আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভবোধ জড়িত, তাই হ'ল লোক-বিশ্বাস। লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক খুবই কম, নেই বললেই চলে। কিন্তু লোক-সংস্কার হল সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে। লোক-সংস্কারের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। লোক-বিশ্বাস খুব সাম্প্রতিককালের হতে পারে বা হয়ও। কিন্তু লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার উভয়েরই মূলে কাজ করে মূলতঃ ঐহিক শুভাশুভবোধ। তবে লোক-বিশ্বাস যেক্ষেত্রে একান্তভাবে একটা ধ্যান ধারণা, মানসিক ক্রিয়া মাত্র, সেক্ষেত্রে লোক-সংস্কারের সঙ্গে কিছু আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।[৫]

এ থেকে বোঝা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার অভিন্ন বলে মনে হলেও উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বিভিন্ন ধরনের লোকবিশ্বাস ও সংস্কার লোকসমাজে বিদ্যমান যেমন, জাদু, জ্যোতিষগণনা, লোকঔষধ, মন্ত্র, শুভাশুভের চিহ্ন, বিভিন্ন বিধি-নিষেধ ইত্যাদি। তবে শুধু লোকসমাজ নয়, শহরেও বিশ্বাস-সংস্কারের বিভিন্ন পরিচয় মেলে। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শনের যুক্তিতেও লোকবিশ্বাস ও সংস্কার হার মানে না। তাই বলা যায়,

> কালপরম্পরায় এগিয়ে আসতে আসতে মানুষ তার প্রাচীন বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কারকে বর্জন করে নতুন জ্ঞান, জীবনধারা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে প্রবেশ করেছে– কিন্তু তবু সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আজো মানুষ গর্ব করে বলতে পারে না যে, আদিম সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কারকে সে সম্পূর্ণ বর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। এমনকি সুসভ্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানে সুউন্নত সমাজে পর্যন্ত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের প্রভাব আজো বিদ্যমান-বহু ক্ষেত্রে এগুলোকে চেষ্টা করেও সমাজদেহ থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হয় নি অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বইচ্ছায় বর্জনের কোন চেষ্টাই হয় নি।[৬]

কেননা, বৈরী পরিবেশে নিরুপায় ও অসহায় মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা, যুক্তি-বুদ্ধির উর্ধ্বে অলৌকিকতা ও অসাধ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর এখানেই লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের উৎস নিহিত রয়েছে।

মঙ্গলময় জীবন কামনার্থে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে পরম শ্রদ্ধার সাথে চর্চিত ও লালিত হয় বিবিধ লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কার। বাংলাদেশের কবিরাও কবিতায় নান্দনিকতা সৃষ্টিতে চেতন-অবচেতনে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারকে কাব্যে সম্পৃক্ত করেন। তবে বাংলা কবিতায় লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিচেতনার অন্তর্বয়ন লক্ষ করা যায় চর্যাপদ থেকেই। মূলত

সহজিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সাধনতত্ত্বের গূঢ়ার্থ প্রকাশে চর্যাপদ রচিত হলেও 'চর্যাপদে তৎকালীন লোকায়ত জীবনের সমাজধর্ম, জীবিকা, শ্রম, বিশ্বাস, কর্ম, আনন্দ, সংস্কার, ধর্মীয় জীবনাচরণ, পারিবারিক তথা দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত।'[৭] এর মধ্যে 'চর্যাপদে' লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব সুস্পষ্ট। লোকায়ত সমাজে অমঙ্গল/অশুভের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে দুই-সংখ্যক চর্যায়। এই চর্যায় বর্ণিত গ্রামীণ সমাজে কামরূপকে[৮] তন্ত্র-মন্ত্রের উৎস হিসেবে বিশ্বাস করা হতো। এখনও লোকমানুষ তন্ত্র-মন্ত্র শেখার আদর্শ স্থান হিসেবে কামরূপ কামাখ্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে থাকে। এই পদে তৎকালীন নারীর স্বভাব বিশ্লেষণে প্রসঙ্গক্রমে চর্যাকার কামরূপের কথা উচ্চারণ করেন,

দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই
রাতি ভইলে কামরু জাই ॥[৯]

মধ্যযুগের প্রথম কাব্য নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের চরিত্র ও প্রেক্ষাপট লোকজীবন নির্ভর হওয়ায় এতে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে লোকায়ত সমাজে যাত্রাকালে কিংবা কোন মঙ্গলদায়ক কাজের শুরুতে শুভাশুভ চিহ্ন বিচার করার প্রবণতা পাওয়া যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। লোকায়ত সমাজে হাঁচি দেওয়া, শেয়াল দেখা, কাক দেখা বা ডাক শোনাকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও অশুভ চিহ্নের প্রতি বিশ্বাস অনুরণিত হতে দেখা যায়। আবার বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সার্থক কাব্যপ্রয়াস 'বৈষ্ণব পদাবলি'তে বিভিন্ন পদে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের নানা প্রসঙ্গ যেমন বাম চোখ কাঁপা শুভ ইঙ্গিত, কাক-পাখি কাছে এসে বসা, মুখের পান পড়ে যাওয়াকে শুভচিহ্ন হিসেবে গণ্য, মান পর্বে অভিশাপের ধারণার প্রতি বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ, পুণ্যফলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ, দিব্যি দেওয়া ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্য ও রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যানেও লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি আস্থার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে কুলক্ষণ, মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে সংস্কার পালন, যাত্রাকালে পেছন দেখা/ডাকা, বাম/ডান চোখ কেঁপে ওঠাকে শুভ/অশুভ ভাবা, স্বর্ণ গোধিকা দেখাকে কুলক্ষণ, ভূত তাড়ানোর তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস, ঘি-দই নিয়ে এবং ফুলের ডালি হাতে মালিকে দেখা শুভলক্ষণ ইত্যাদি লোকবিশ্বাস ও সংস্কার এসব কাব্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের ধারাবাহিকতায় বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭০) কাব্যে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের বিভিন্ন অনুষঙ্গ যেমন মন্ত্র, জ্যোতিষ গণনা, জন্ম ও যাত্রাকালে সুলক্ষণ-কুলক্ষণ, তিথি-নক্ষত্রের অবস্থান, শুভাশুভ চিহ্ন ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্তমসর্গে বিবৃত হয়েছে,

... ... লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?[১০]

মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) বিভিন্ন কবিতায় শনির দশা, রাহুর গ্রাস, শাপ-অভিশাপ, মনস্কামনা পূরণে দেব-দেবী কিংবা প্রাকৃতিক/অপ্রাকৃতিক শক্তির আনুকূল্য লাভে বিভিন্ন আচার-ক্রিয়া-অনুষ্ঠান মানত ও পালন, পূর্বজন্মের পাপে অমঙ্গল সাধন, তন্ত্র-মন্ত্র ও যাত্রাকালে শুভাশুভ চিহ্নে বিশ্বাসসহ বহুবিধ সংস্কার পালন লক্ষণীয়। 'কথা' কাব্যের "দেবতার গ্রাস" কবিতা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে মানবহিতৈষী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকায়ত সমাজে অহরহ ঘটে যাওয়া লোকবিশ্বাসে আস্থা প্রকাশের পাশাপাশি লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারকে অন্ধভাবে পালন করার প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শন করেছেন।

মূলত তিরিশের দশকের কবিরা বাংলা কবিতায় আধুনিকতার রূপরেখা স্থাপন করলেও, তাঁদের প্রভাব কেবল ভাষা ও শৈলীতে সীমাবদ্ধ ছিল না; সমাজ-বাস্তবতা ও সংস্কৃতিচেতনায়ও তা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সময়ের কবিতায় মানবতাবোধ, প্রেম, প্রকৃতি ও সামাজিক সংকট একত্রিত হয়ে নতুন কাব্যভঙ্গি তৈরি করেছে। এই ধারার মধ্যে জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) বাংলা কবিতায় লোকসংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ সার্থকভাবে প্রয়োগ করে এক অনন্য কাব্যধারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কবিতায় গ্রামীণজীবনের কঠোর, কঠিন, নির্মম ও সংগ্রামী বাস্তবতা শুধু নন্দনবোধের উপকরণ নয়, বরং এক গভীর সমাজ-সংস্কৃতির দলিল হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস, আচার, উৎসব, মূল্যবোধ ও জীবনসংগ্রামের চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার লোকজ মানসচিত্রকে সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কার (যেমন দিব্যি প্রদান, যাদুটোনা, তন্ত্র-মন্ত্র, তুকতাক, তাবিজ-কবজ, শিরনি মানত, ঘরের চালে হুতুম ডাকাকে অশুভ ভাবা ইত্যাদি) শুধু বিষয়বস্তুর অংশ নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক বিশ্বদৃষ্টির প্রকাশ। এই কারণেই জসীমউদ্‌দীন "পল্লিকবি" হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা অর্জন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ,

ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে অকল্যাণ এ সুর
মরণের দূত এল বুঝি হায় হাঁকে মায় দূর–দূর ।[১১]

মূলত তিরিশের দশকের কবিবৃন্দ এবং জসীমউদ্‌দীনের লোকজ কাব্যধারা পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, ওমর আলী, সৈয়দ শামসুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, –প্রত্যেকেই এই উত্তরাধিকারের ভেতর থেকে নিজেদের কাব্যস্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আল মাহমুদের কবিতায় লোকজ অনুষঙ্গ, মিথ ও ঐতিহ্য আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক বোধের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, আর শামসুর রাহমানের কবিতায় শহুরে চেতনার ভেতরেও গ্রামীণ ভাষা ও আবেগের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে জসীসউদ্‌দীনের লোকজ কাব্যধারা ও তিরিশের দশকের আধুনিক কাব্যচেতনার সংমিশ্রণ বাংলাদেশের কবিতা ও কবির মধ্যে এক ধারাবাহিক, আবহমান সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে– যেখানে গ্রাম,শহর, আধুনিকতা, লোকায়ত জীবন ও নাগরিকচেতনা সমানভাবে সহাবস্থান করেছে।

এই ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা কবিতায় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের কবিতায় লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের বিভিন্ন দিকের বিস্তৃত চিত্রায়ণ দেখা যায়। তিরিশের দশকের কাব্যপ্রভাবে পঞ্চাশের দশকের কবিরা যখন নগরকেন্দ্রিক জীবন-জটিলতা, অবক্ষয়, নৈরাশ্যভরা জগতে বিচরণ করে কাব্য রচনায় নিবিষ্ট ছিলেন; তখন আল মাহমুদ আধুনিক প্রকরণে আবহমান গ্রামবাংলার ঐতিহ্য, দেশজতা, মানবতা, প্রেম, সমকালীন জীবনবাস্তবতা, সাম্যবাদ ইতিহাস ও জাতিসত্তার বিষয়কে একত্রিত করে এক গভীর সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মাণ করেছেন। মূলত, 'স্বদেশচেতনা ও স্বকাল নিঃসরিত হৃদয়-অনুভবকে আলিঙ্গন করে আল মাহমুদের কাব্যযাত্রার শুরু।'[১২] তাঁর কবি প্রতিভা একদিকে নাগরিক আধুনিকতার ভাবনাকে ধারণ করেছে, অন্যদিকে গ্রামীণ সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস ও ঐতিহ্যের শিকড়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থেকেছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *লোক লোকান্তর* (১৯৬৩) প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা কবিতায় নতুন এক কণ্ঠের আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে *কালের কলস* (১৯৬৬), *সোনালী কাবিন* (১৯৭৩), *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো* (১৯৭৬), *অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না* (১৯৮০), *আরব্য রজনীর রাজহাঁস* (১৯৮৩), *বখতিয়ারের ঘোড়া* (১৯৮৫), *দ্বিতীয় ভাঙন* (১৯৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর কাব্যচেতনার বিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এসব কাব্যে ইতিহাসচেতনা, জাতীয় পরিচয়, ধর্মীয় প্রতীক ও লোকজ বিশ্বাসের গভীর উপস্থিতি তাঁর কবিতাকে একটি স্বতন্ত্র নন্দনবোধে উন্নীত করেছে। আল মাহমুদের কাব্যভাষা তাই একই সঙ্গে ঐতিহ্যনির্ভর ও আধুনিক–যেখানে লোকসংস্কৃতির মাটি ও ইতিহাসের প্রতিধ্বনি মিলেমিশে এক অনন্য কবিসত্তার রূপ ধারণ করেছে।

আল মাহমুদের কবিতায় লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কার কেবল বিষয়বস্তুর উপাদান নয়, বরং তাঁর কাব্যদর্শনের মূল কাঠামো। । তাঁর *লোক লোকান্তর*, *সোনালী কাবিন*, *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো*, *আরব্য রজনীর রাজহাঁস* ও *দ্বিতীয় ভাঙন*-এর কবিতাগুলোতে গ্রামীণ সমাজের বিশ্বাস, নিয়তি, পাপ-পুণ্যের ধারণা, অভিশাপ ও আদর্শের ভাষা এক ধরনের লোকধর্মীয় দর্শনে রূপ নেয়। যার ফলস্বরূপ তাঁর কবিতায় লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের অনিবার্য অনুষঙ্গ জাদু, জাদুকর, জাদুমন্ত্রপুত দ্রব্যাদ্রি ও মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির বিচিত্র বিন্যাস লক্ষ করা যায়। লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে রোগ-ব্যাধি, সুখ-দুঃখ, শান্তি-সফলতা, শত্রুর বিনাশ ও যাবতীয় অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পেতে জাদুর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কেননা আবহমানকাল ধরেই জাদু লোকসমাজের প্রাত্যহিক কর্মপ্রক্রিয়ার প্রচলিত অভ্যাস। আল মাহমুদ মানসিক প্রশান্তি লাভে জাদু, জাদুকর ও মন্ত্রকে উপমান চিত্ররূপে কবিতায় ব্যবহার করেছেন,

> … … … …
> সতর্ক আত্মার ওপর কড়ির মতন
> দুটি চোখ অনুভবের জাদু দিয়ে
> পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছি।
> নিসর্গের ফাঁকে ফাঁকে যখন বিষণ্ন হাওয়ার রোদন
> দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে, আমি সেই
> ধ্বনির জাদুকর।[১৩]

এখানে নাগরিক কবি নগরের ক্লান্তি, অবসাদ, নৈরাশ্য, অস্থিরতা দূরীকরণে জাদুকর হয়ে মন্ত্র ও জাদুর আশ্রয়ে লোকায়ত প্রকৃতিতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। প্রকৃতির অবারিত নির্মল সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি প্রকৃতির বিষণ্নতাকে ভালোবেসে নিজের দুঃখবোধ ভুলে যান; হয়ে যান প্রকৃতির বিষণ্নতা সৃষ্টিকারী ধ্বনির জাদুকর। লোকজ বিশ্বাস ও সংস্কার-অনুরাগী আল মাহমুদ প্রকৃতি ও প্রাণীর বিবর্তন ধারার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে নান্দনিক ও লোকজ আবহদানে 'জাদুমন্ত্র' শব্দ যোগ করেন "প্রকৃতি" নামক কবিতায়,

> বুঝিবা স্বপ্নের ঘোরে আইল বাঁধা জমিনের ছক
> বৃষ্টির কুয়াশা লেগে অবিশ্বাস্য জাদুমন্ত্রবলে
> অকস্মাৎ পাল্টে গেলো। ত্রিকোণ আকারে যেন
> ফাঁক হয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী।
> … … … …
> ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক
> আমার চেতনা জুড়ে খুঁটে খায় পরস্পর বিরোধী আহার।[১৪]

উল্লিখিত কবিতায় প্রকৃতিতে বসবাসকারী বৈচিত্র্যময় প্রাণীজগতের পারস্পরিক বিরোধের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে কবি জাদুমন্ত্রের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন। মূলত প্রকৃতিতে বাস্তুসংস্থান (Ecology) প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার নিয়মতান্ত্রিক উপায় হলেও লোকায়ত সমাজে এই চলমান প্রক্রিয়া বিস্ময়ের বস্তু; লোকচৈতন্যে তা জাদুর কারসাজি। লোকসমাজের এই বিশ্বাস কবি দার্শনিক অভিনিবেশে কবিতায় প্রতিফলিত করেছেন। জাদুটোনা, মন্ত্রতন্ত্র ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস লোকায়ত সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বহুবছর ধরে লোকায়ত জীবনে এগুলো চর্চিত হয়ে আসছে। মন্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকে কবি "মন্ত্র" শিরোনামে কবিতাও লিখেছেন। আবার "অসীম সাহস" নামক কবিতায় ফররুখ আহমেদের অবদানের প্রশংসার্থে তাঁর কবিতার ধ্বনিকে মন্ত্রের ধ্বনির সাথে তুলনা করেছেন। তবে মন্ত্রের তাৎপর্যময় উপস্থাপনা লক্ষ করা যায় কবির "রবীন্দ্রনাথ" কবিতায়,

এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ উত্থান রহিত
নৈশব্দের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না।
নদীগুলো দুঃখময়, নির্পতগ মাটিতে জন্মায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্যকোন শ্যামলতা নেই।[১৫]

কবি সমকালীন স্বদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক দুঃসময়ের নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন অনেকটা টি. এস. এলিয়টের 'The Waste Land' কাব্যের ভঙ্গিতে । বৈশাখের নিষ্ফলা প্রকৃতির মতো চারদিকে স্নিগ্ধতার খরা, সংস্কৃতিহীনতা, দেশজুড়ে অবিশ্বস্ততার হাওয়া, নিঃশব্দতাকে কবি মন্ত্রপুত নিঃশব্দ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কবির কাব্যচেতনার উজ্জ্বল জায়গা জুড়ে রয়েছে মন্ত্র। তাই দেশের দুঃসময়ে তিনি মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে আল মাহমুদ সাম্যবাদী আদর্শে শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিহাস ও সাম্যবাদী চেতনার মিশ্রণে স্বদেশে শোষণহীন, সুষম নিরাপদ সমাজগঠনের স্বপ্নে কবি আবহমান বাংলার লোকজ মন্ত্রের স্মৃতিকে শিকড় হিসেবে পুনরুদ্ধার করেন,

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতের উঠিয়েছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেনো না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।[১৬]

উল্লেখ্য, স্বদেশে সুষম বণ্টননীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কবি কবিতায় আদিম জনগোষ্ঠী 'কিরাত'[১৭]দের প্রসঙ্গ আনেন। তারা যৌথ শ্রম ও জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কবি প্রিয়তমাকে সঙ্গী করে সাম্যবাদের কর্মীদের বীর খেতাবেও ভূষিত করতে চান। কবির কাছে এটাই লোকধর্ম। প্রকৃতপক্ষে কবি আল মাহমুদ লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির বিশ্বস্ত ধারক ও বাহক। ফলে তাঁর কবিতায় আধুনিকতা ও সাম্যবাদের পাশাপাশি আবহমান বাংলার লোকঐতিহ্যের শিল্পিত উৎসারণ যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক।

দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ এবং নদীকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা কবির লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি ভাবনারই পরিচায়ক। সাম্প্রতিক কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো, বিশেষ করে প্রমত্ত পদ্মা আজ মৃতপ্রায়। কবির মনে হয়েছে, মন্ত্রবলে বিশাল অজগর যেমন সুতায় পরিবর্তিত হয়, তেমনি এক অশুভমন্ত্রে প্রলয়ঙ্করী পদ্মা পরিণত হয়েছে ক্ষীণকায় দড়িতে। কারণ হিসেবে তিনি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঞ্জীবনী নদীর উজানে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। এটি পদ্মার প্রবহমানতা রুখে দিয়েছে। স্বদেশপ্রেমী কবি পদ্মাসহ অন্যান্য বড় নদীর বেহাল দশায় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের অনুষঙ্গ মন্ত্রের কুফলে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন,

মা-গঙ্গার শাড়ি খুলে ফারাক্কায় গঙ্গা পূজারীরা
বেঁধেছে প্রবাহমান সঞ্জীবনী নদীর উজান,
কখনো ডেকেছি যারে যমুনা, জাহ্নবী, সদানীরা
মানুষের ধর্মেকর্মে, রূপকে, গাথায় চলমান-
হে পদ্মা প্রলয়ঙ্করী, কীর্তিনাশা, ভৈরবী সুন্দরী;
এখন সে নিদ্রা যায় শামুকের খোলের ভিতর,
যেন এক অজগরী মন্ত্রবলে হয়ে গেছে দড়ি,
যারে নিয়ে মজা করে গুটিকয় ব্রাহ্মণ ইতর।[১৮]

মন্ত্রের কুফলে শঙ্কিত হলেও কবি নদীর স্রোতস্বিনীরূপ ফিরে পাওয়ার উপায় হিসেবে মন্ত্র ও তুকতাকের প্রতিই আস্থা রেখেছেন। যদিও নদীর শীর্ণকায় রেখা কবিকে সংশয়বিদ্ধ করে, তবুও কবি চেতন-অবচেতনে মন্ত্র ও তুকতাকের কার্যকর প্রয়োগে নদীর গতিশীলতা ফিরিয়ে আনার আশাবাদ ব্যক্ত করেন "শুধু চোখ তার পিস্টন" কবিতায়।

অশুভ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেতে তাবিজ-কবজ-মাদুলির ব্যবহার লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আল মাহমুদের মনেও তাবিজ-কবজ-মাদুলি সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। ফলে শৈশবের দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পাওয়া কবির মানসলোকে মায়ের বেঁধে দেওয়া রুপোর মাদুলি লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হয়ে সঞ্চারিত হয় কবিতায়,

স্বপ্নের আঘাতে আমি সারারাত ঘুমাতে পারি না
অথচ বালককালে মা আমার দক্ষিণ বাজুতে
রুপোর মাদুলী তুই বেঁধেছিলি স্বপ্ন না দেখার,
তবু কেন জননী গো খোয়াবের অসুখ সারে না![১৯]

সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্যের প্রতিকার বিধানেও কবি রুপোর মাদুলি ব্যবহারে সমাজে শান্তি আনয়নের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন "স্বপ্নের উৎপাত" কবিতায়।

সমাজে মানবরূপী দানবের উচ্ছেদে কবি দিগ্বিজয়ী বীর আমীর তৈমুরের মতো সাহসী যোদ্ধা হতে চান "দিগবিজয়ী খঞ্জরাজা" কবিতায়। এ সাহসী কাজে সাহস যোগাতে কবির রয়েছে মায়ের আশীর্বাদ-অঙ্কিত লোহার বলয় অর্থাৎ তাবিজ কিংবা মাদুলি। লোকায়ত বিশ্বাস অনুযায়ী জাগতিক সংকট ও প্রতিকূলতা এড়াতে মাদুলি/তাবিজের রয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা। মাতৃদত্ত লোহার বলয় নিয়ে কবি সাহিত্যজগতে নতুন সৃজনে ব্যাপৃত হতে চান,

বাহুতে
বীরের সদগতির জন্য মায়ের দোয়াঙ্কিত লোহার বলয়।
....
আমি খোঁড়া রাজা আমীর তৈমুর।
মানুষের নতুন মানবিক উদ্ভাবনার জন্যে, ছন্দ ও নতুন কবিতার জন্য চাই যুদ্ধ।
চাই
মানবরূপী দানবের উচ্ছেদ।[২০]

ঐতিহ্যসচেতন কবি আল মাহমুদের কবিতায় লোকঐতিহ্যের অনুষঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে মৃত্যুভাবনা। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। কবির ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। কবি এখন আর টগবগে তরুণের ন্যায় দাঁড়াতে পারেন না। কিন্তু কবিতাচর্চার জন্যে তিনি আরো অনেকদিন পৃথিবীতে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চান। তাই অসাবধানতাবশত হারিয়ে যাওয়া কালো তাগা'র[২১] অনুসন্ধানে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন, যা যৌবনের শক্তি ও সামর্থ্যের সুরক্ষায় মা বেঁধে দিয়েছিলেন,

একটা যৌবন। আমি সোনার টাকায় তা পরিশোধ করেছি
তবু সে আমার সবচেয়ে গোপন যে
কালো তাগার ঘুনসিটি বেঁধে দিয়েছিলেন আমার মা
জানত না কেউ।
....
তবুও আমি উঠে দাঁড়াতে চাই
কলমে, কালিতে, সুরমায় আঁকা দুটি মাত্র চোখ
কী ডাগর, কী অমর,
আর কী অসহায়?[২২]

লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে শাপ-অভিশাপ সম্পর্কিত বিশ্বাস গুরুত্বের সাথে আচরিত হয়ে থাকে। মূলত কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলে যে ব্যক্তির কারণে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে বা ঘটে, তার প্রতি অভিসম্পাত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয়ে থাকে। লোকায়ত সমাজে লোকমানসের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী এতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এক ধরনের মানসিক সান্ত্বনা খুঁজে পায়। আল মাহমুদেরও শাপ-অভিশাপজনিত প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস বিভিন্ন কবিতায় ব্যাপৃত হয়ে আছে,

নখের আঁচড়ে কারা লিখে রেখে গেছে কারো প্রিয়তম নাম।
নাম, যেন পাষাণ ফাটিয়ে দেয়া কয়েকটি ছোবল।
সব কান্না ফিরে আসে, ফিরে আসে
শাপ-অভিশাপ;
ঘৃণায় ছিটিয়ে দেয়া থুতুতে পিচ্ছিল
দেয়াল তেমনি থাকে আমাদের মাথার ওপরে।[২৩]

কবিতাটিতে চিত্রশিল্পী মর্তুজা বশীরের (১৯৩২-২০২০) সাহসী চিত্রকর্মের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কবি শাপ কিংবা অভিশাপ ফিরে আসায় বিশ্বাসের চিত্র অঙ্কন করেন। লোকায়ত সমাজের প্রবল বিশ্বাস হচ্ছে অভিশাপ বংশপরম্পরায় ফিরে ফিরে আসে। আল মাহমুদেরও কবিতালোকে অভিশাপের অশুভ ছায়া প্রভাব বিস্তার করে আছে।

প্রাচীনকাল থেকেই লোকায়ত সমাজে 'বশ' সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বশীকরণের মূল উদ্দেশ্য অন্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা বা বাধ্য করা। কবিরাজ, হুজুর, বেদে, ওঝা ও সন্ন্যাসীদের সহযোগিতায় বিশেষ মন্ত্র-তন্ত্রে ও জড়িবুটি প্রয়োগে কাউকে বশীভূত করা যায়, এমন বিশ্বাস প্রচলিত লোকসমাজে। আল মাহমুদের লোকমানসে বশীকরণ সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও সংস্কার লক্ষ করা যায়। তাঁর কবিতায় কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করা অর্থে 'বশ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সমকালীন অন্যায়, অসাম্য ও রাজনীতির দুরবস্থা প্রকাশে কবি লোকপুরাণ ও বিশ্বাসের উৎকৃষ্ট অন্বয় করেছেন "জোহরা তারার প্রতি" কবিতায়। ইসলাম, ইহুদি ও পারসিক ধর্মগ্রন্থের পাতায় জাদু-মন্ত্রের প্রভাবের কথা জানা যায়। সেখানেই উল্লেখ রয়েছে হারুত-মারুত ফেরেস্তাযুগল ও মানবী জোহরার নাম। জোহরাকে বাবেলের বিষণ্ন বালিকা আখ্যায়িত করে কবি জোহরার তারা হয়ে যাওয়ার লোকশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। জাদুকরী যুগের মানুষরূপী ফেরেস্তা যুগলের কাছে আকাশে ওঠা-নামার মন্ত্র শিখে জোহরা আকাশে উঠলেও মন্ত্র ভুলে নিচে নেমে আসতে পারেনি। আকাশেই তার দেহ তারায় রূপান্তরিত হয়। যা জোহরা তারা বা শুকতারা নামে পরিচিত। মূলত কবিতাটিতে ফেরেস্তা ও মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে কবি 'বশ' শব্দ যুক্ত করে লোকপুরাণ ও লোকবিশ্বাসের গভীর সংযোগ সৃষ্টি করেন,

> তবে ছলাকলা শিখে নাও, বশ করো অবশীভূতাকে।
> ভুলে যাও পাপপুণ্য অলৌকিক উদ্যানের ফল
> একদা আয়ত্ত ছিলো ভুলে যাও, শেখো জাদুটোনা
> শিখে নাও রাজনীতি, গুপ্তহত্যা, পৌর লেনদেন
> নির্ভাবন খুন হোক প্রতিদ্বন্দ্বী সকল যুবারা।
> তারপর বলো দেখি, আগন্তুক আশ্চর্য প্রাণীরা
> আদমের উদ্ভাবন আল্লার মহত্তম শিল্প ছিলো কি না?[২৪]

লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে দিব্যি বা দিব্যদান জ্ঞাপনার্থে লোকবিশ্বাস প্রচলিত। 'গোপনে হোক, প্রকাশ্যে হোক কোন কাজে সততা এবং নিষ্ঠা রাখার জন্য প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত শক্তির কাছে যে শপথ করা হয়'[২৫] সেটিই দিব্য বা দোহাই দেওয়া। মূলত নিজের বক্তব্যকে জোরালো করা বা কারো কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার স্বার্থে স্রষ্টা বা পবিত্র গ্রন্থ বা বিশেষ কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাকৃতিক শক্তির নামে দিব্য দেওয়া, শপথ করা, সাক্ষ্য মানা, দোহাই দেওয়া লোকায়ত সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। দোহাইকারী তাঁর অঙ্গীকারাবদ্ধ বাক্য পূরণে ব্যর্থ হলে অমঙ্গলের মুখোমুখি হবে বলেও বিশ্বাস রয়েছে গ্রামীণ সমাজে। তাই দেখা যায় ঐতিহ্যানুরাগী কবি আল মাহমুদ লোকপ্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের দোহাই দিয়ে শাশ্বত ও সত্য প্রেমের আহ্বানে প্রিয়তমার কাছে কাব্যিক সুষমায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। ফলে তাঁর কাব্যে প্রেম কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়; লোকবিশ্বাসের প্রতীক দিয়ে তা গ্রামীণ সমাজের আবেগ ও সামাজিক চেতনার সঙ্গে একত্রিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন,

> বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই
> দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর,
> লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই
> হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর।
> কথার খেলাপ করে আমি যদি জবান নাপাক
>
> কোনদিন করি তবে হয়ো তুমি বিদ্যুতের ফলা,
> ....
>
> আমার চুম্বন রাশি ক্রমাগত তোমার গতরে
> ঢেলে দেবো চিরদিন মুক্ত করে লজ্জার আগল
> এর ব্যতিক্রমে বানু এ-মস্তকে নামুক লানৎ
> ভাষার শপথ আর প্রেমময় কাব্যের শপথ।[২৬]

'সাক্ষ্য' মানা লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মূলে রয়েছে ব্যক্তি বা প্রকৃতির ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রদর্শন করা। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ মানুষ অসহায় হয়ে ব্যক্তি বা প্রাকৃতিক বস্তুকে সাক্ষ্য মেনে প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলাতে চায়। আল মাহমুদও তাঁর কাব্যবলয়ে এই লোকবিশ্বাসের বৈচিত্র্যময়তা ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি ও নারীর রয়েছে গোপন সংযোগ। প্রকৃতি যেমন বৃষ্টির জলে সিক্ত হয়ে উর্বর হয়ে ওঠে, তেমনি আদিম বিশ্বাস অনুযায়ী 'বন্ধ্যা

নারীকে দুটি স্রোতের সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়ে আনলে তার বন্ধ্যাত্ব'[২৭] ঘুচে যায়, এবং সে সন্তানবতী হয়। লোকবিশ্বাসের এই দিকটি কবি আরো বিশ্বাসযোগ্য আবহ প্রদানে প্রকৃতিকে সাক্ষী মেনে লোকপরম্পরাকে আধুনিক কাব্যে শিল্পিত রূপদানে সমর্থ হন,

তুমিই দাঁড়িয়ে আছো, আর সবি নত ও নরম
বৃষ্টির বিধানে সিক্ত এমনকি তোমারও কামিজ
প্রকৃতি গুছিয়ে দেয় সবুজের সহজ শরম
আমার আধারে কাঁপে একবিন্দু জীবনের বীজ
দক্ষিণে দরিয়া সাক্ষী আর উচ্চে সাক্ষী হিমালয়
তোমার উচিত শুধু খুলে দেয়া, আর কিছু নয়।[২৮]

পশুপাখির ডাকসংক্রান্ত বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় কবি আল মাহমুদের কাব্যে। পেঁচার ডাক অকল্যাণ ও বিভীষিকার প্রতীক। লোকায়ত সমাজে এ বিশ্বাস গভীরভাবে প্রোথিত, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান। আল মাহমুদের কাব্যেও পেঁচা অশুভ-অমঙ্গল ও অকল্যাণের পাখি বলে প্রতীকায়িত হয়েছে। "কিছু মনে নেই" কবিতায় মা ও ছেলের কথোপকথনের ভেতর দিয়ে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা ও বিশ্বাসের আন্তঃসম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সচ্ছল বর্তমানের বিপরীতে লোকায়ত মায়ের স্মৃতিচারণে উন্মোচিত হয় অতীতের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন, যেখানে পেঁচার ডাক নবজাত শিশুর জন্য অমঙ্গলসূচক বলে ধরা হতো। লোকায়ত সমাজে, "নবজাত শিশুর উপর পেঁচার কুদৃষ্টি পড়লে স্বাস্থ্যহানি"[২৯] এমনকি মৃত্যু ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস প্রচলিত। কবি এই বিশ্বাসকে কেবল পুনরাবৃত্ত করেন না; তিনি একে ব্যবহার করেন মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে, যার মাধ্যমে উন্মোচিত হয় লোকজ জীবনের আশঙ্কা, স্মৃতি ও মিথের বাস্তবতায় রূপান্তরিত এক গভীর কাব্যসত্য। যেমন,

পেঁচার ডাকে আমার ভয়, এদিকে তোর কান্না
ঘরে নেই পুরুষ। তোর বাপ গেছে চরের ধান
পাহারা দিতে। কে-যেন আজান হাঁকলো
হাজী শরীয়তের মতো গলা। ধাই মেয়ে
তোকে দোলাতে দোলাতে বললো,–
বল লেংটা তুই কোন মসজিদে যাবি?–
মনে আছে?[৩০]

পেঁচা যেমন অমঙ্গলের-অন্ধকারের প্রতীক স্বরূপ; তেমনি লক্ষ্মীর বাহন[৩১] হিসেবেও পরিচিত। লক্ষ্মীর মূল লক্ষ্য সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ক্ষমা, তপস্যা করা। এজন্য তাকে পেঁচক-ধর্ম পালন করতে হয়। পেঁচার ধর্ম হলো গোপনে বাস করা। দিনের আলোয় চলাফেরা তাঁর জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। আর লক্ষ্মী হলো ধন-সম্পদের দেবী। এজন্যই ধন-সম্পদের আগমনার্থে "লক্ষ্মীপেঁচা"[৩২] সমাজে আদরণীয়। লোকায়ত সমাজে পুঁজিবাদী শোষণ ও অর্থনৈতিক কূটচক্রের ইঙ্গিত উন্মোচনে আল মাহমুদ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে "খরা সনেটগুচ্ছ" কবিতায় ঋণের অর্থপ্রাপ্তির মুহূর্তে লক্ষ্মীপেঁচার প্রতীক যুক্ত করেছেন। এই উল্লেখ কেবল ঐশ্বর্যের সংকেত নয়; বরং পুঁজিবাদী প্রলোভনের অন্তর্লীন বিদ্রূপ–যার মাধ্যমে কবি অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য ও লোকজ মূল্যবোধের বিপর্যয়কে তীব্রভাবে চিহ্নিত করেছেন।

পেঁচার ন্যায় কাক ও টিকটিকি অশুভ-অমঙ্গল-অকল্যাণের চিহ্ন হিসেবে পরিচিত। কাকের কর্কশ ডাক নেতিবাচক অর্থে প্রচলিত লোকায়ত জীবনে। 'রাত্রে কাকের ডাক অধিক অমঙ্গলজনক। গৃহের চারপাশে কাকের দল ঘুরাফিরা করলে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়।'[৩৩] কবি আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সংকটকে গভীর প্রতীকে প্রকাশ করেছেন। তিস্তা ও অনুরূপ স্রোতস্বিনী নদীগুলোর শীর্ণধারায় তিনি দেখিয়েছেন জল-রাজনীতির ষড়যন্ত্রে নিঃশেষিত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের করুণ পরিণতি। পানির অভাবে কৃষিপ্রধান জনপদে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি। আর কৃষক সমাজ অনাহারে-অর্ধাহারে হয়ে পড়ে জীবনসংগ্রামে পরাজিত। এই বাস্তবতার পটভূমিতে কবি কাকের অশুভ ডাকের লোকবিশ্বাসকে প্রতীকে রূপ দেন–যেন দারিদ্র্য. অনিশ্চয়তা ও সামাজিক অকল্যাণের সম্মিলিত রূপক। তাঁর কাব্যে ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও সমাজচেতনা মিশে যায় এক সমকালীন লোকজ বাস্তবতার তীক্ষ্ণ বয়ানে। যেমন,

কাকের অশুভ ডাকে খা খা করে উঠেছে সংসার
দুটি পাতা রেল যেন না মেশার শপথের সাপ,
....
খাতার পাতায় কষা যোগফল, পিপাসার জল?
প্রান্তরের মরানদী স্রোত চেয়ে ফেলে দীর্ঘশ্বাস
এবার তোমার তিস্তা খুলে দাও, তোমার তিতাস।[৩৪]

সমকালীন বৈশ্বিক ক্ষমতা বিস্তারের আগ্রাসন ও অস্ত্রযুদ্ধের কুফল প্রকাশে কবি টিকটিকির ডাকের[৩৫] আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্ষেত্র বিশেষে টিকটিকির ডাককে সম্মতিসূচক বলে মান্য করা হয়। বিশেষ করে বক্তার কথোপকথনের সময় টিকটিকির টিকটিক শব্দ সমর্থনযোগ্য ইঙ্গিত বহন করে বলে ভাবা হয়। বক্তার বক্তব্য অসত্য হলেও গ্রামীণ সমাজে তা সদর্থক অর্থে গৃহীত হয়ে থাকে। লোকায়ত সমাজের এ বিশ্বাসকে কবি যুক্ত করেন এভাবে,

আমরা কোনো ঘড়িকেই কালস্রোত গণনার
উপযোগী মনে করতে পারছি না। আমরা
কবিরা টিকটিক শব্দে ঘুমুতে অভ্যস্ত নই।
কারণ যে কোনো টিকটিক শব্দ দেয়ালে টিকটিকির
ঠিকঠাক ডাকের মত সমর্থন ধন্য হয়ে উঠতে পারে।
আমরা ধ্বংসের, মৃত্যুর, নৈঃশব্দের এবং শহরগুলোর
কংকাল নিয়ে কাব্য রচনা করতে চাই না।[৩৬]

ভবিষ্যৎবাণী, সৌভাগ্যের লক্ষণ নির্ধারণ, দুর্ভাগ্যের কারণ বিশ্লেষণ ও তার প্রতিকার বিধান-এই সবই গ্রামীণ সমাজে জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতিষীর উপর নির্ভরতার ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। অর্থযোগ-হানি থেকে শুরু করে জীবনের নানা সংকট ও প্রতিকূলতা মোকাবেলায় গ্রামীণ মানুষ জ্যোতিষশাস্ত্রকেই আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে এটি কেবল ভাগ্যগণনার বিদ্যা নয়, বরং লোকায়ত সমাজের বিশ্বাসব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক মানসের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আল মাহমুদও ঐকান্তিক সততায় 'ফলিত জ্যোতিষ' (দিনকাল, মাস, ঋতু ও প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুযায়ী চাষ পদ্ধতি)-এর বিষয় অর্থাৎ খনা ও তাঁর বচন কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। খনা বিদুষী নারী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও কৃষি সমাজের ত্রাণকর্তা। চাষাবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত বচন এখনো গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। "প্রকৃতি" কবিতায় বর্ষা ঋতুর আগমন প্রসঙ্গে কবি খনার কথা স্মরণ করেন। বর্ষায় প্রকৃতি নবরূপে সজ্জিত ও উর্বরা হয়ে ওঠে যা লোকায়ত সমাজের জীবন ও জীবিকার উৎকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খনাও তাঁর বচনে বর্ষা ঋতুকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কবি তাঁর কবিতায় খনার বচনের যৌক্তিকতা প্রকৃতির বিবর্তন ধারার প্রেক্ষাপটে উপমানচিত্রে অন্বিত করেন,

চতুর্দিকে খনার মন্ত্রের মতো টিপটিপ শব্দে সারাদিন
জলধারা ঝরে! জমির কিনার ঘেঁষে পলাতক মাছের পেছনে
জলডোরা সাপের চলন নিঃশব্দে দেখছি চেয়ে।
বাহুতে আমার
আতঙ্কে লাফিয়ে উঠছে সবুজ ফড়িং।[৩৭]

কবির লোকঐতিহ্যপ্রীতির অনবদ্য প্রকাশ লক্ষ করা যায় "খনার বর্ণনা: সনেট পঞ্চক" কবিতায়। এই কবিতায় কবি খনার জীবনী, তাঁর আত্মকথনে প্রকৃতি ও চাষবাস সম্পর্কিত বচনের শুভাশুভ বা কল্যাণচেতনার সুমার্জিত রূপের পরিচয় উন্মোচন করেন। কৃষিনির্ভর আবহমান বাংলায় জীবন-যাপনের প্রধান উপায় শস্য উৎপাদন। এ জন্য আবহাওয়া, ঋতুর বৈশিষ্ট্য, মাটি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বীজরোপণ, উত্তোলন প্রভৃতি প্রসঙ্গে খনার বচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হলেও খনার বচনের নির্দেশনা কৃষিনির্ভর জীবনের মূল প্রেরণা ও পাথেয়। এই বোধের নির্যাস কবি আধুনিক কবিতার শৈলীতে পৃথিবী, নারী ও প্রকৃতির অপূর্ব মেলবন্ধনে সমকালের প্রেক্ষাপটে কবিতায় বিন্যস্ত করেন,

প্রকৃতির ছায়া আমি হে রাজন, আমিই সৃজন
মনুষ্যের শুক্র ধরি। বুঝি উষ্ণ বীর্যের বেদনা,
ধানে ও কাউনে বাঁচি, রক্ষা করি চাষীর গোধন,
বরাহের পুত্রবধূ মিহিরের ঠোঁটকাটা খনা।[৩৮]

ভূত-প্রেত, জিন-অশরীরী-মায়াবী-যোগিনীতে বিশ্বাস লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। দীর্ঘদিন ধরে লোকায়ত সমাজে এই সংক্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত। আল মাহমুদেরও লোকমানসে ভূত-প্রেত-জিন-অশরীরী-মায়াবী-যোগিনী সম্পর্কিত বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন কবিতায় এ সম্পর্কিত ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন,

ভয়াবহ ভূতের আর্শিতে
আমাকে পশুর মতো মনে হতে থাকে। ধূসর হাওয়ায়
পাশব কেশর ওড়ে, অনাচারী বিষয়ী নখর
নষ্ট করে গাছপাতা নারীশিশু জনতা শহর![৩৯]

উপর্যুক্ত কবিতায় সমকালীন সময়ের সংকট, অস্থিরতা, ক্ষোভ ও বেদনা কবির দ্বিধাদ্বন্দ্বময় মানসচেতনায় যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নাগরিক জীবন যন্ত্রণার অনুভব তৈরি করে, তারই শিল্পিত রূপ প্রকাশে কবি ভূতের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেন।

কেননা গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতিতে অমঙ্গল-অহিতকর পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূত-প্রেতের হাত রয়েছে বলে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। ভূত-প্রেতের মতো মায়াবী জিনে বিশ্বাস লোকায়ত সংস্কারের অন্তর্গত। ইসলামধর্ম অনুযায়ী জিনের অস্তিত্ব রয়েছে পৃথিবীতে। কবি আল মাহমুদের কবিতায় লোকসমাজে প্রচলিত জিনের বিভিন্ন (যেমনঃ জিনেরা রহস্যময়, অশরীরী, রূপ পরিবর্তনে পারদর্শী, অলৌকিক শব্দ উৎপাদনকারী, বিভীষিকাময় পরিবেশ অবতারণা ও ভীতি প্রদর্শনকারী) বৈশিষ্ট্যাবলির পরিচয় পাওয়া যায়। জিনের অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিশ্বাসের প্রাবল্য থেকে জিনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে জিন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শিশুতোষ ছড়া "হতাম যদি জিন" কবিতায়। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত,

আদম হওয়ার কষ্ট বড়; হতাম যদি জিন
জিনের দেহে দেখবে না কেউ কায়ার কোন চিন্।
ইচ্ছে মতন বদলে যাওয়ার শক্তি হলে পরে
বাঘ না বেড়াল যা খুশি হও ঢোকো পড়ার ঘরে।

....
জিনের আছর কী মজাদার সবাই ভীতুর ডিম
ভূতের ডরে সবার বুকেই জমতো ভয়ের হিম।[৪০]

আল মাহমুদের কাব্যবলয়ে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস ও সংস্কার প্রতিবিম্বিত। মূলত সময় পরিক্রমায় কবির আদর্শগত যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো; তারই প্রভাব তাঁর কাব্যাদর্শেও লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য,

> দৈবক্রমে জেলখানায় আমি আমার কবি জীবনের সার্থকতা নিয়ে ভেবে দেখার সুযোগ পাই এবং সেমেটিক ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর একটি তুলনামূলক স্টাডি এবং গবেষণার সুযোগ পাই। সেহেতু বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্রগুলো আগেই আমার মোটামুটি আয়ত্ত ছিল, সে কারণে পবিত্র কোরআন সহজেই আমার বোধগম্য হতে থাকে এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণাই পাল্টে যায়। এ সময় আমি ব্যাপকভাবে প্রাচীনকাব্য অধ্যয়ন শুরু করি। একই সাথে সেমেটিক, পারশিয়ান, হিন্দু এবং ল্যাটিন জগৎ আমার কাছে উন্মুক্ত হতে থাকে। এভাবেই যাকে বলে কাব্যের উত্তরাধিকার, আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কেবল একটি দেশ বা ভাষার উত্তরাধিকার নয়, বরং সারা পৃথিবীর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার।[৪১]

ফলে তিনি বাংলার লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিকে ইসলামি মূল্যবোধ, ভাবধারা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে কবিতায় সমন্বয় করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো সমকালীন অন্যায়, অসাম্য, শোষণ-বঞ্চনা ও অমানবিক সমাজের পরিবর্তে ন্যায়নিষ্ঠ, সুষম, শোষণ-বঞ্চনাহীন ও মানবিক মূল্যবোধ সমন্বিত সমাজ গড়ে তোলা। ব্যঞ্জনাময় দীপ্ত ভাষায় তিনি স্রষ্টা, স্রষ্টার মহিমা, সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্ভব ও ইতিহাস, নবীগণের ত্যাগ-তিতিক্ষা, মহিমা, সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্ভব ও ইতিহাস, স্রষ্টার প্রতি নবীদের আত্মনিবেদন, ভক্তি ও সান্নিধ্যলাভ, কোরআনের মহিমাপূর্ণ কাহিনি, পৃথিবী ধ্বংস থেকে পুনরুত্থান, মুসলিম জীবনাচরণ সর্বোপরি ইসলামের ধর্মীয় মূল্যবোধ অত্যন্ত সততা ও আন্তরিকতায় আলংকারিক অনুষঙ্গে তাঁর কবিতায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। ফলে ঐতিহ্য ও ধর্মগত বিশ্বাসের যৌথ শিল্পরূপের আকর হয়ে উঠেছে আল মাহমুদের কাব্য-পরিমণ্ডল। যেমন,

তোমার শাড়ির দিকে চোখ গেলে বেড়ে যায় সবুজে ঈমান
এখনও বুকের কাছে ধরে আছো পাথরকুচির ক'টি পাতা?
হোক তা চিত্রিত লতা, পোশাকের মুদ্রিত বাগান,

....
হ্যাঁ আমি জেনেছি বটে একবিন্দু রক্ত থেকে আমি
এসেছি তোমার কাছে- এখন যা দমনীয় নয়;
আমার অক্ষর বুঝি আমার মতোই দ্রুতগামী
নগরে প্রচার করে পরিপূর্ণ পল্লবের ভয়।
অথচ ঘুমের মধ্যে কারা যেন, মানুষ না জিন
আমার কবিতা প'ড়ে ব'লে ওঠে আমিন, আমিন।[৪২]

উপর্যুক্ত কবিতায় অশরীরী জিনের প্রতি আল মাহমুদের বিশ্বাস প্রতিফলিত। লোকায়ত সমাজে ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনায় প্রবল বিশ্বাসী; কেননা ঈমানই ইসলামের মূল ভিত্তি। আধুনিক কবি এই কবিতায় ঈমান ও আমীন শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করেন অত্যন্ত কাব্যিক ভঙ্গিমায়।

বাংলার লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি আদিমকাল থেকেই অসাম্প্রদায়িক চেতনানির্ভর। সব ধর্মের মানুষের সমন্বিত বসবাস পরিলক্ষিত হয় গ্রামীণ সমাজে। বছরের পর বছর জুড়ে এই একত্রে থাকার মূল প্রেরণা ও শক্তি পারস্পরিক সহনশীলতা ও

শ্রদ্ধাবোধ। এই ঐতিহ্যগত প্রেরণায় আল মাহমুদ তাঁর কাব্যে দেব-দেবী, শিবলিঙ্গ, মন্দির, স্বর্গ-নরক, পূজা, পুরোহিত, শ্মশানঘাট, প্রসাদ, বেদ, পঞ্চমুখ, অপদেবতা, জন্ম-জন্মান্তরবাদ, গায়ত্রীমন্ত্র প্রভৃতি নানা ধর্মীয় অনুষঙ্গের উল্লেখ করেন। যেমন,

ভেবেছি তো অন্ধকারে আমি হবো রাতের পুরুত
আদিম মন্দিরে একা তুমি এসো নগ্নতার দেবী
মগ্নতার অন্ধকারে আমি যার একমাত্র সেবী,
ধূপের গন্ধের স্বাদ দেবে এনে এখন যে দূত–
সে তো শুধু গন্ধবহ পৃথিবীর পুষ্পময় মাস
পুরানো মদের গন্ধে ভরা যার রাতের বাতাস,
অসহ্য আনন্দ হেনে তোমাকেই করে যে নিখুঁত,
অথবা হৃদয়ে ঢালে যন্ত্রণার করুণ নির্যাস।[৪৩]

এই কবিতায় হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের ব্যবহারে কবির ব্যক্তি প্রেমের স্বরূপ প্রস্ফুটিত। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজা করার পবিত্র স্থান হলো মন্দির। এই মন্দিরের অপরিহার্য অনুষঙ্গ দেবী, পুরুত, ধূপের গন্ধ ইত্যাদি। কবি মন্দিরের এই আবহে প্রিয়তমাকে নিয়ে অভিসার করতে চান উল্লিখিত কবিতায়। লোকায়ত ঐতিহ্যে প্রেমের গোপন অভিসার কবির লোকসংস্কৃতিপ্রীতির উৎকৃষ্ট পরিচায়ক।

লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে পার্থিব সংকট, সমস্যা, যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনাকে সহনীয় বা মেনে নেওয়ার প্রবণতা থেকে লোক মানসে নিয়তি সংক্রান্ত বিশ্বাসের জন্ম। ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গেও এর যোগ রয়েছে। কৃষিনির্ভর লোকসমাজে প্রকৃতিনির্ভর মানুষের জীবন অনিশ্চয়তা ও রহস্যে আবৃত; প্রকৃতির অপ্রত্যাশিত বৈশিষ্টের কাছে সে চিরকাল অসহায়। আল মাহমুদের কবিতায় এই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে নিয়তিবাদী বিশ্বাসের উপস্থিতির মাধ্যমে, যেখানে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে প্রকৃতি এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে প্রতিভাত। যেমন,

মনে হয়, আমি শুরু করি। কিন্তু শেষ করে নিয়তি আমার
আমি বলি, সকালে দেখি সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে
গেছে যেসব কথাবার্তা সে আমার নয়
প্রতিবাদ করি না আমি।[৪৪]

লোকসমাজের সমগ্রতা উঠে আসে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। যার ফলে লোকমানুষের অভ্যাস, চাল-চলন, আনন্দ-বেদনা, মন-মানসিকতা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য, খাদ্য, পোশাক, ধর্ম, বিশ্বাস-সংস্কার-আচার সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা যায়। আল মাহমুদের কাব্যজগতের মূল উপজীব্য মাটি, মানুষ ও লোকঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন। ফলে তাঁর কবিতায় লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির সমগ্রতা অনিবার্যরূপে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে অনেক সমালোচক তাঁকে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের উত্তরসূরি হিসেবে গণ্য করে থাকেন। তবে উভয়ের কবিতায় ঐতিহ্য চেতনা শিল্পিত হলেও আঙ্গিক, ভাষা-প্রয়োগ ও জীবনদৃষ্টির স্বতন্ত্রতায় জসীমউদ্‌দীন যেখানে "পল্লিকবি" রূপে স্বীকৃত, সেখানে আধুনিক কাব্যভাষায় নতুন মাত্রা সংযোজনের মাধ্যমে আল মাহমুদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বতন্ত্র আধুনিক কবিসত্তা হিসেবে। চল্লিশের দশকের আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) কবিতায় লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি বিশেষ করে লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগের সূচনা করেছিলেন। পঞ্চাশ দশকে আল মাহমুদ সেই প্রবণতাকে সৌকর্য ও সৌগন্ধ্যের ব্যাপকতা দান করেছেন। তাঁর সমকালে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ও পরবর্তীকালে কবি আসাদ চৌধুরীর কবিতায় গ্রামীণ জীবনে প্রত্যাবর্তনের সুরে লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের অনুষঙ্গ ধ্বনিত হয়। তবে সমকালীন ও পরবর্তীকালের কবিদের তুলনায় আল মাহমুদের কাব্যে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের ব্যবহার অধিক পরিণত ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। কেননা লোকবিশ্বাস ও সংস্কারকে তিনি শুধুমাত্র রূপক বা চিত্রকল্পে সীমাবদ্ধ রাখেননি; একে সমাজচেতনা, ধর্মীয় মনস্তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার অন্তর্নিহিত শক্তি হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। ফলে তাঁর কাব্য সমকালীন ও পরবর্তী বাংলা কবিতায় লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির প্রাণবন্ত প্রয়োগ ও অন্তর্নিহিত সামাজিক অর্থ উদ্‌ঘাটনে বিশেষ স্থান অধিকার করে। এখানেই কবি আল মাহমুদের স্বাতন্ত্র্য।

তথ্যনির্দেশ

[১] অনু হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা : লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৭), পৃ. ১৭

[২] আবদুল হাফিজ, *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ* (ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭০), পৃ. ৬১

[৩] মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা, অনার্য, ২০১১), পৃ. ৯৮

[৪] তদেব, পৃ. ৯৯

[৫] বরুণকুমার চক্রবর্তী, *লোক-বিশ্বাস ও লোকসংস্কার* (কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৬), পৃ. ২০

[৬] মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪), পৃ. ৪৮৩

[৭] রফিকউল্লাহ খান, *কবিতা ও সমাজ* (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭), পৃ. ৩৩

[৮] 'কামরূপ বর্তমানে ভারতের আসাম রাজ্য এবং বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ এর অংশ ছিল'। দ্র.: bn.m.wikipedia.org. visited: 05.04.2021

[৯] Muhammad Shahidullah (ed.), 'Text 2', *Buddhist Mystic Songs*, (Dhaka, Mowla Brothers, 2nd Edition, 2013), p. 31

[১০] মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'মেঘনাদবধ কাব্য', *মধুসূদন রচনাবলী*, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), (কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০০৪) পৃ. ৯০-৯১

[১১] জসীমউদ্‌দীন, 'পল্লী জননী', *রাখালি*, (ঢাকা, পলাশ প্রকাশনী, ২০১৬) পৃ. ৯০-৯১

[১২] নুরউল করিম খসরু, 'শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগান, লোক-লোকান্তর ঃ পুনর্বার', *দশজন কবি*, (ঢাকা, শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৪৭

[১৩] আল মাহমুদ, "পিপাসার মুখ", 'লোক লোকান্তর', *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা, অনন্যা, ২০০৯), পৃ. ৩৮-৩৯

[১৪] ঐ, "প্রকৃতি", 'সোনালি কাবিন', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ৮৩

[১৫] ঐ, "রবীন্দ্রনাথ", 'কালের কলস', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ৭৯

[১৬] ঐ, "সোনালি কাবিন: ১০", 'সোনালি কাবিন', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ১০৪

[১৭] কিরাত জাতির অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় এরা "পূর্ব হিমালয়স্থ প্রাচীন কালের দেশ অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের সীমান্ত রাজ্যগুলো ছিল 'কিরাত' জাতির দেশ ও রাজ্য, প্রধানত মঙ্গলয়েড জাতির মানুষের দেশ।" দ্রষ্টব্য: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *কিরাত- জনকৃতি*, (কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯৫১,) পৃ. ৬০-৬৫

[১৮] আল মাহমুদ, "খরা সনেটগুচ্ছ: ৫", 'দোয়েল ও দয়িতা', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ৩৪২

[১৯] ঐ, "ফেরার পিপাসা", 'কালের কলস', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ৫৮

[২০] তদেব, পৃ. ৮৩-৮৪

[২১] 'কোমর ও বাহুতে পরিধেয় সূত্র বিশেষ। তবে কোমরেই তাগা অধিক পরিহিত হওয়ায় একে 'কোমরমাল'ও বলা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কালো রঙের যে বিশেষ সূত্র তাগায় ব্যবহার করা হয়, তাকে 'কৈতম' বলে। লোকবিশ্বাস এই যে, এই তাগা বিভিন্ন প্রকারের অতি-প্রাকৃত শক্তির কু-প্রভাব প্রতিরোধে সক্ষম।' দ্রষ্টব্য: সঞ্জীব নাথ, "তাগা", *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলকাতা, অর্পণা বুক ডিস্টিবিউটার্স, ২০০৫), পৃ. ২২২

[২২] আল মাহমুদ, "আরোহন", 'নগরের কথা নয় চাষবাসের গল্প', *কবিতাসমগ্র-২*, পৃ. ২১৬

[২৩] ঐ, "দেয়াল", 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ১৩৩-৩৪

[২৪] ঐ, "জোহরা তারার প্রতি", 'প্রহরান্তের পাশফেরা', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ২৫৮

[২৫] ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি', (ঢাকা, গতিধারা, ২০০৪), পৃ. ২৭৭

[২৬] আল মাহমুদ, "সোনালি কাবিন: ১৪", 'সোনালি কাবিন', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ১০৬

[২৭] ফজলুল হক তুহিন, *আল মাহমুদের কবিতা: বিষয় ও শিল্পরূপ*, পৃ. ২৯৭

[২৮] আল মাহমুদ, "সনেট: ১", 'বখতিয়ারের ঘোড়া', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ১৯৪

[২৯] তদেব

[৩০] আল মাহমুদ, "কিছু মনে নেই", 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ১৬২

[৩১] 'লক্ষী হলেন একজন হিন্দু দেবী। তিনি ধনসম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী। বিষ্ণুর পত্নী। তার অপর নাম মহালক্ষ্মী। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা।' দ্রষ্টব্য: bn.m.wikipedia.org. visited: 05.03.2021

[৩২] 'লক্ষীপ্যাঁচা বা লক্ষ্মীপেঁচা এক ধরনের পেঁচা প্রজাতির পক্ষীবিশেষ। মাঝারি থেকে বৃহৎ আকৃতির হয়ে থাকে এ পাখিটি। শরীরের তুলনায় মুখমণ্ডল অনেকাংশেই বড় হয়ে থাকে। লম্বা পাখনা, ফ্যাকাশে ও হৃদয় আকৃতি মুখের গড়ন এবং বর্গাকৃতির লেজ প্রধান এর বৈশিষ্ট্য। ...শক্তিশালী পায়ের থাবার সাথে সুতীক্ষ্ন নখর রয়েছে।' দ্রষ্টব্য: bn.m.wikipedia.org. visited: 05.03.2021

[৩৩] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পৃ. ২৫৪

[৩৪] ঐ, "খরা সনেটগুচ্ছ: ৬", 'দোয়েল ও দয়িতা', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ৩৪২

[৩৫] 'টিকটিকি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী খনা সম্পর্কিত একটি লোকশ্রুত ব্যাখ্যা প্রচলিত রয়েছে। '–কিংবদন্তি আছে খনার কর্তিত জিহ্বা টুকরো ফেলে দিলে এক টিকটিকি তা খেয়ে নেয়। বরাহমিহির সে-দৃশ্য দেখে টিকটিকিকে আশীর্বাদ করেন- সমস্ত টিকটিকির এই জিহ্বা পাওয়া হোক। মানুষের ভালোমন্দ কথার উত্তরে টিকটিক শব্দ করলে সেকথা সত্যি হবে। টিকটিকির ডাককে তাই আমরা সত্যি বলে মানি।' দ্রষ্টব্য: সুভাষ মিস্ত্রী, "লোকায়ত কৃষিভাবনায় ডাক ও খনার বচন", *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পা.) পৃ. ৬৩৭

[৩৬] আল মাহমুদ, "স্করপিয়ন", 'উড়ালকাব্য', *কবিতাসমগ্র-২*, পৃ. ৭৭

[৩৭] ঐ, "প্রকৃতি", 'সোনালি কাবিন', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ৮৩

[৩৮] ঐ, "খনার বর্ণনা: সনেট পঞ্চক: ২", 'দ্বিতীয় ভাঙন', *কবিতাসমগ্র-২*, পৃ. ২৫

[৩৯] আল মাহমুদ, "বিষয়ী দর্পণে আমি", 'লোক লোকান্তর', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ১৯

[৪০] ঐ, "প্রথমার জন্য তিনটি ছড়া: হতাম যদি জিন", 'নদীর ভিতরে নদী', *কবিতাসমগ্র-২*, পৃ. ৫৮

[৪১] আল মাহমুদ : সাক্ষাৎকার, সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পা.), পৃ. ৭১

[৪২] ঐ, "সবুজ ঈমান", 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ১৫১-১৫২

[৪৩] ঐ, "সিক্ষনী", 'লোক লোকান্তর', *কবিতাসমগ্র-১*, পৃ. ২৩

[৪৪] ঐ, "প্রেম", 'বারুদগন্ধী মানুষের দেশ', *কবিতাসমগ্র-২*, পৃ. ১৬২